ইউনিট
১২

আর্থিক ও রাজস্ব নীতি
Monetary and Fiscal Policy

ভূমিকা

একটি দেশের দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে তথা একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। আর্থিক ও রাজস্ব নীতির আলাদাভাবে কতগুলো হাতিয়ার রয়েছে। রাজস্ব নীতির হাতিয়ারগুলো সাধারণত সরকার প্রয়োগ করে থাকে। অন্যদিকে আর্থিক নীতির হাতিয়ারগুলো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োগ করে থাকে। তবে উভয় নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অগ্রগামী থাকা।।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১২.১ : আর্থিক নীতি

পাঠ ১২.২ : রাজস্ব নীতি

পাঠ ১২.৩ : মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক ও রাজস্ব নীতি

পাঠ ১২.৪ : ফিলিপস রেখা

পাঠ ১২.১ আর্থিক নীতি
Monetary Policy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- আর্থিক নীতির সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন;
- আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূলপাঠ

আর্থিক নীতি (Monetary Policy)

যে নীতির মাধ্যমে দেশের অর্থ কর্তৃপক্ষ অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আর্থিক নীতি বা মুদ্রানীতি বলে। দেশের অর্থ কর্তৃপক্ষ বলতে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমন্বিত ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। আর্থিক নীতির উল্লিখিত দেশের অর্থ কর্তৃপক্ষ বলতে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমন্বিত ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। আর্থিক নীতির উল্লিখিত সংজ্ঞাটিকে কখনও সংকীর্ণ সংজ্ঞা বলা হয়।

প্রসারিত সংজ্ঞা প্রদান করেন অধ্যাপক পল এইনজিগ (Paul Einzig)। তাঁর মতে, 'আর্থিক ও অনার্থিক লক্ষ্যে পরিচালিত সব রকমের আর্থিক ও অনার্থিক সিদ্ধান্ত এবং গৃহীত পদক্ষেপ, যাদের দ্বারা দেশের অর্থব্যবস্থা প্রভাবিত হয়, তাদের সমন্বিত রূপায়ণকে আর্থিক নীতি বা মুদ্রানীতি বলে।' প্রসারিত সংজ্ঞাটির মধ্যে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ নীতি ছাড়াও মজুরি নীতি ও বাণিজ্য নীতির মতো অনেক নীতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর্থিক নীতির পৃথক অস্তিত্বও তখন বিপন্ন হতে পারে। কাজেই আর্থিক নীতির সংকীর্ণ সংজ্ঞাটিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যায়।

আর্থিক নীতি ও ঋণনীতি কি একই? (Are Monetary Policy and Credit Policy Same?)

আর্থিক নীতি ও ঋণ নীতি একই বলে মনে হতে পারে। ঋণ নীতি আর্থিক নীতির অংশ। তবে আর্থিক নীতির সবটাই ঋণ নীতির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির লক্ষ্য। আর্থিক নীতির দ্বারা অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে অর্থের যোগানের সবটাই ঋণ নয়, চাহিদা আমানত ছাড়াও শক্তিশালী মুদ্রা অর্থের যোগানের অন্যতম উপাদান। তাছাড়া আর্থিক নীতি প্রত্যক্ষভাবে অর্থের যোগানকে ঘিরে পরিচালিত হলেও অর্থের চাহিদার ওপর তার পরোক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। কাজেই আর্থিক নীতি শুধুমাত্র ঋণ নীতি নয়, ঋণ নীতির তুলনায় আর্থিক নীতির আওতাটি বড়।

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও জড়িত সীমাবদ্ধতা (Objectives of Monetary Policy and the Limitations Involved)

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সম্পর্ক রেখে আর্থিক নীতির বিভিন্ন উদ্দেশ্য বিবেচিত হয়। আর্থিক নীতির একটি উদ্দেশ্য অপরটির সাথে সংগতিপূর্ণ নাও হতে পারে। কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আপস করে নিতে হয়, অর্থাৎ তাকে স্থির করতে হয় একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে আরেকটি কতটা ছেড়ে দিতে হবে।

(ক) মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা : আর্থিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। অধ্যাপক নার্কস অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বলতে জাতীয় আয়ের সেই অবস্থাকে বুঝিয়েছেন, যে অবস্থায় সাধারণ কর্মহীনতা ও মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ থাকবে না।

মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার নীতিটিকে নিম্নলিখিত যুক্তির আলোকে সমর্থন করা যায়

১. মূল্যস্তরের নিম্নগতি বেকার সমস্যা বাড়ায়, উৎপাদন কমায়।

২. মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণকে বিঘ্নিত করে।

৩. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা থাকলে বাণিজ্যচক্রজনিত অসুবিধা থাকে না।

৪. অর্থ যেহেতু মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, তাই অর্থের মূল্য স্থির রাখা প্রয়োজন।

৫. সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে অর্থেও মূল্য অপরিবর্তনীয় হওয়া প্রয়োজন।

৬. সামাজিক অসাম্য দূর করতে হলে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা দরকার।

মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত উদ্দেশ্যটির সীমাবদ্ধতা

১. আর্থিক নীতির লক্ষ্য হলো সাধারণ বা গড় মূল্যস্তর ঠিক রাখা। কিন্তু সাধারণ মূল্যস্তরের মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন এককের মূল্যও নিহিত থাকে। সাধারণ মূল্যস্তর যেদিকে যায়, প্রতিটি দ্রব্যের মূল্যও সেদিকে যাবে, এটি ঠিক নয়। কোনো বিশেষ দ্রব্যের দাম বাড়লে বা কমলে ক্রেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, যদিও সেক্ষেত্রে গড় মূল্যস্তর হয়তো অপরিবর্তিত থাকে।

২. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সবসময় সহায়ক নয়। অর্থনীতিতে স্থবিরতা (Stagnation) এলে মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা বিনিয়োগকারী ও উৎপাদনকারীদের প্রেরণা দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে এবং তখন মূল্যস্তর নেমে আসার কথা। এ অবস্থায় সরকার যদি অর্থের যোগান বাড়িয়ে কৃত্রিম উপায়ে পূর্বের উচ্চ মূল্যস্তর বজায় রাখে অর্থাৎ মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখে, তবে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪. সাধারণ মূল্যস্তরের ঠিক কোন অবস্থাটি স্থিতিশীল রাখা প্রয়োজন তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধাবস্থা এবং যুদ্ধের পরের মূল্যস্তরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে।

(খ) বিনিময় হারের স্থিরতা : বিনিময় হারের দ্বারা বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালিত হয়। প্রত্যেক দেশেরই বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখা প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল, তখন স্বর্ণের অবাধ চলাচলের মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় থাকত। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের (IMF) সহায়তায় বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় রাখা হয়। IMF-এর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক নীতির দ্বারা একটি সঠিক বিনিময় নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

সীমাবদ্ধতা

১. বিনিময় হারের স্থিরতা রক্ষা করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতাকে অবজ্ঞা করা হয়। কিন্তু সামগ্রিক জীবনযাত্রা অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে। অর্থের বহির্মূল্য ও অভ্যন্তরীণ মূল্যের মধ্যে পৃথকীকরণ ঠিক নয়। দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে উভয়ে মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে হবে, একটিকে অবজ্ঞা করে নয়।

(গ) অর্থের নিরপেক্ষতা (Neutrality of Money) ও বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ : নিরপেক্ষ আর্থিক নীতির লক্ষ্য হলো মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনের প্রভাব দূর করে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা। অধ্যাপক কোল (Cole) মন্তব্য করেন, অর্থের নিরপেক্ষতা বলতে অর্থের পরিমাণের অপরিবর্তনীয়তা বোঝায় না, বরং মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা বোঝায়।

R G Hawtrey এবং তাঁর অনুসারীরা বাণিজ্যচক্রকে অর্থসংক্রান্ত বিষয় বলে বিবেচনা করেন। বাণিজ্যচক্রের কুপ্রভাবগুলো দূর করতে হলে ব্যাংক সৃষ্ট ঋণকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। উপযুক্ত আর্থিক নীতির দ্বারা সুদের হার পরিবর্তিত হলে বাণিজ্যচক্রের অসুবিধা দূর করা যায়।

সীমাবদ্ধতা

পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক উত্থান-পতন দূর করা এ নীতির দ্বারা সম্ভব নয়। এর দ্বারা কেবলমাত্র স্বল্পকালীন স্থিতিশীল অর্থনীতিতে মূল্যস্তর স্থির রাখা যায়। কেইনস ও তাঁর অনুসারীদের মতে, বাণিজ্যচক্র আর্থিক কারণে ঘটে না। তাই আর্থিক নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যচক্রকে নিয়ন্ত্রণও করা যায় না।

(ঘ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি : অর্থের যোগান বাড়িয়ে সুদের হার কমানোকে সুলভ মুদ্রানীতি বলে। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হারের ওপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা স্থির থেকে সুলভ মুদ্রানীতির দ্বারা সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। এর দ্বারা দেশের আয় এবং সার্বিক উন্নয়নের ওপরও প্রভাব পড়ে। চিত্রে তা লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক নীতির (মুদ্রানীতির) সীমাবদ্ধতা
(Limitations of Monetary Policy in a Developing Country like Bangladesh)

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নরূপ :

ক. অনুন্নত ও অসংগঠিত অর্থ বাজার : বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অর্থ বাজার তেমন সংগঠিত নয়। দেশজ অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদানের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুরোপুরি আছে বলে মনে হয় না। উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক নীতির কার্যকারিতার পথে অর্থবাজারের অনুন্নত অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

খ. অ-আর্থিক খাত : উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অ-আর্থিক খাত ভূমিকা পালন করে। বিনিময় প্রথা গ্রামীণ জীবনে এখনও পরিলক্ষিত হয়। অ-আর্থিক খাত ও আর্থিক খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন কঠিন। এমতাবস্থায় আর্থিক নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হতে পারে না।

গ. অলসভাবে রক্ষিত মুদ্রা : বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে জনগণের হাতে অলস জমাকৃত অর্থের পরিমাণ কম নয়। অলসভাবে ফেলে রাখা অর্থ (বিছানার নিচে, কলসের মাঝে, বাঁশের খুঁটিতে টাকা রাখার অভ্যাস) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় না। ফলে প্রসারিত আর্থিক নীতির দ্বারা কাম্য অবস্থায় পৌঁছানো যায় না।

ঘ. সময়ের পশ্চাদ্‌পদতা : আর্থিক নীতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। প্রশাসনিক কালক্ষেপ আর্থিক নীতির কার্যকারিতাকে দুর্বল করে তোলে।

আর্থিক নীতির উপকরণ (Instruments of Monetary Policy)

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দেশের অর্থ কর্তৃপক্ষ নিম্নে লিখিত উপকরণগুলোর সাহায্য নেয় এবং নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করে :

১. নোট প্রচলনের নিয়ন্ত্রণ : অর্থের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা আর্থিক নীতির মূল লক্ষ্য অর্থ যোগানের। অন্যতম ইস্যুকৃত নোট বা কারেন্সি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ ও লেনদেনের প্রকৃতি লক্ষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালী মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২. ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া অর্থের যোগানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো আর্থিক নীতির উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের উপকরণ হলো– ক. ব্যাংক হারের পরিবর্তন, খ. খোলাবাজার নীতি এবং গ. ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাতের পরিবর্তন।

ক. ব্যাংক হারের পরিবর্তন : ব্যাংক হার বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত একটি সুদের বাট্টার হার বোঝাবে, যার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারে, ব্যাংক হার বাড়লে বাণিজ্যিক ব্যাংক হারের সুদের হার বাড়ে। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ পরিমাণ সংকুচিত হয়ে আসে। অর্থাৎ অর্থের যোগান তখন কমে আসে। আবার ব্যাংক হার কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকে ঋণ প্রসারে সুযোগ করে দেয় তখন অর্থের যোগানও বাড়ে। কাজেই আর্থিক নীতির একটি অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যাংক হার বিবেচিত হয়।

খ. খোলা বাজার নীতি : যখন খোলাবাজার এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে বেশি অর্থের যোগান থাকে ফলে ঋণের পরিমাণও বাড়ে। অপরদিকে ঋণপত্র বিক্রি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হতে অর্থ তুলে নিতে পারে। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ তথা অর্থের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাতের পরিবর্তন : বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যূনতম জমা রাখার অনুপাত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিবর্তন করতে পারে। দেশের ঋণের পরিমাণ কমাতে বা অর্থের যোগান কমাতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাত বাড়িয়ে দেয়। আবার অর্থের যোগান বা ঋণের পরিমাণকে অপসারিত করতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ন্যূনতম রিজার্ভ অনুপাত কমিয়ে দেয়।

উল্লিখিত পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কতগুলো নির্বাচিত পদক্ষেপ বা গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। যেমন : বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর নির্দেশ আরোপ, নৈতিক চর্চা, ঋণ বরাদ্দকরণের সীমা নির্ধারণ এবং ঋণের পরিমাণকে ক্ষেত্রবিশেষ স্থানান্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ তথা অর্থের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায় যে, দেশে মোট নোট প্রচলন ও ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করার উপকরণগুলো আর্থিক নীতির উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সারসংক্ষেপ

- যে নীতির মাধ্যমে দেশের অর্থ কর্তৃপক্ষ অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আর্থিক নীতি বা মুদ্রানীতি বলে;
- আর্থিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা;
- দেশে মোট নোট প্রচলন ও ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করার উপকরণগুলো আর্থিক নীতির উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাঠ ১২.২ রাজস্ব নীতি
Fiscal Policy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- আর্থিক নীতির সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন;
- আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূলপাঠ

রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy)

রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার (Public Finance) অন্যতম বিষয় হলো রাজস্ব নীতি। প্রসারিত দৃষ্টিতে রাজস্ব নীতি বলতে সরকারের আয়-ব্যয়সংক্রান্ত নীতিকে বোঝানো হয়। সংকীণ দৃষ্টিতে সরকারের ব্যয় এবং কর এই দুয়ের সমন্বিত নীতি বলে। বাজেটের মধ্যে যেহেতু সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ থাকে, তাই অনেক সময় বাজেটসংক্রান্ত গৃহীত নীতিকে রাজস্ব নীতি বলা হয়। রাজস্ব নীতিকে কখনও প্রসারমান, কখনও সংকোচনমূলক, আবার কখনও নিরপেক্ষ নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রাজস্ব নীতির হাতিয়ার বা উপকরণ (যেমন–সরকারি ব্যয় কর ও ভর্তুকি) যখন দেশের আয় ও নিয়োগ প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়,তখন তাকে প্রসারমান রাজস্ব নীতি বলে। আবার যখন রাজস্ব নীতি উপকরণগুলোকে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি বলে। রাজস্ব নীতি উপকরণ যদি এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে উৎপাদন ও নিয়োগ স্তরের ন্যায় প্রকৃত চলকগুলো প্রভাবমুক্ত থাকে তবে তাকে নিরপেক্ষ রাজস্ব নীতি বলে।

রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্য (Objective of Fiscal Policy)

রাজস্ব নীতি উদ্দেশ্য বহুবিধ। সরকারের সম্মুখে অসংখ্য দাবি ও প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যও বহু রকমের। তবে অধ্যাপক মুসগ্রেভের মতে সেই উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি বিস্তৃত ভাগে (broad category) দেখানো যায়। (১) অর্থনীতি বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সম্পদের কাম্য বণ্টন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। (২) অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ। (৩) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন।

১. অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সম্পদের কাম্য বণ্টন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন : রাজস্ব নীতির মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। তা ছাড়া কর্মহীনতা দূর করে পূর্ণ নিয়োগ বা পূর্ণ নিয়োগের নিকটতর কাম্য অবস্থা অর্জনও রাজস্ব নীতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের রাজস্ব উপকরণ হিসেবে সরকারি ব্যয়, কর ও হস্তান্তর ব্যয়সংক্রান্ত নীতিগুলোর উপযুক্ত প্রয়োগ প্রয়োজন।

(খ) সম্পদের কাম্য ব্যবহার : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের কাম্য ব্যবহার রাজস্ব নীতি অন্যতম উদ্দেশ্য। অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে থেকে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সম্পদের স্থানান্তর প্রয়োজন। অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে অধিক কর আরোপ এবং উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে কর রেহাই ও ভর্তুকি প্রদান করে সম্পদের স্থানান্তর সম্ভব।

২. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

আয়ের সমবণ্টন রাজস্ব নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ধনী ও দারিদ্র্যের মধ্যে বৈষম্য কাম্য নয়। সেই বৈষম্য দূরীকরণে প্রগতিশীল কর ও হস্তান্তর ব্যয় ভূমিকা রাখে।

৩. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

রাজস্ব নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো বেকারত্বকে ন্যূনতম স্তরে রেখে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করে ও মন্দা থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য

রাজস্ব নীতির ভূমিকা ও উদ্দেশ্যাবলি অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উন্নত দেশের রাজস্ব নীতির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো উন্নীত অর্থনৈতিক অবস্থা বজায় রাখা। এই উন্নীত অবস্থা কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব ও মূল্যর স্থায়িত্ব রক্ষার ওপর নির্ভরশীল। রাজস্ব নীতির লক্ষ্যও সেই স্থায়িত্ব রক্ষায় নিবদ্ধ। উন্নয়শীল দেশের নিকট অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার মূলধন গঠন ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠন, জনশক্তিকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো এরকম নানা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রাজস্ব নীতির মধ্যে এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

জাতিসংঘের অর্থনীতিসংক্রান্ত বিভাগ (UN Department of Economic Affairs) কর্তৃক ১৯৪৯ সালে নিযুক্ত সাবকমিশনারের রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

১. আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণ ও সঙ্গে-সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারের বিস্তৃতি এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি রোধ।

২. অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে জড়িত মুদ্রাস্ফীতি রোধ।

৩. অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক ক্ষেত্রগুলোর উন্নতি এবং উন্নতির গতিকে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পরিচালনা।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতা

(Limitation of Fiscal Policy in a Developing Country like Bangladesh)

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়শীল দেশে রাজস্ব নীতির কার্যকারিতার পথে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক বিন্যাস ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজস্ব নীতির কতিপয় সীমাবদ্ধতা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব গুণক প্রক্রিয়ার পথে বাধা : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব অন্যতম সমস্যা। এমতাবস্থায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা তথা গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব গুণক প্রক্রিয়া কার্যকর হওয়ার পথে রড় রকমের অন্তরায়।

২. সংগৃহীত কর রাজস্বের পরিমাণ স্বল্প : বাংলাদেশের সংগৃহীত কর রাজস্বের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাও অনমনীয়।

৩. অনুৎপাদনশীল সরকারি ব্যয় : রাজনৈতিক কারণে সরকারকে অনেক সময় বিভিন্ন অনুৎপাদনমূলক কাজে ব্যয় করতে হয়। বরং ব্যয়িত অর্থের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৪. হস্তান্তর ব্যয় ও ভর্তুকি কর্মসূচি সফল হয় না : বাংলাদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সরকারকে হস্তান্তর ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। উৎপাদনক্ষেত্রে ভর্তুকি দিতে হয়, কিন্তু তার মাধ্যমে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

৫. পূর্ত কর্মসূচি গ্রহণ সার্বিক সমাধানের উপযুক্ত নয় : গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করার জন্য সরকার পূর্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে; কিন্তু পূর্ত কর্মসূচি দ্বারা মৌসুমি বেকারত্ব দূর হলেও সার্বিক বেকারত্ব দূর করা সম্ভব নয়।

৬. প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা : বাংলাদেশের প্রশাসসিক স্তরে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। তাই রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হয়।

৭. ঘাটতি অর্থসংস্থানের ওপর নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশ সরকারকে ঘাটতি অর্থসংস্থানের ওপর অধিক নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় কারেন্সি নোট ছাপিয়ে ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা চলে। এমতাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। তাই সিদ্ধান্তে আসা যায় বাংলাদেশে রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।

সারসংক্ষেপ

- রাজস্ব নীতিকে কখনও প্রসারমান, কখনও সংকোচনমূলক, আবার কখনও নিরপেক্ষ নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রাজস্ব নীতির হাতিয়ার বা উপকরণ (যেমন সরকারি ব্যয় কর ও ভর্তুকি) যখন দেশের আয় ও নিয়োগ প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়,তখন তাকে প্রসারমান রাজস্বনীতি বলে;
- বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়শীল দেশে রাজস্ব নীতির কার্যকারিতার পথে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক বিন্যাস ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পাঠ ১২.৩ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক ও রাজস্ব নীতি

Monetary & Fiscal Policy in Controlling Inflation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষায় রাজস্ব নীতির ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- মন্দা থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুদ্রাস্ফীতি বণ্টন আর্থিক ও রাজস্ব নীতির তুলনামূলক কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষায় রাজস্ব নীতির ভূমিকা (Role of Fiscal Policy in Stabilizing Price Level)

[বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধী রাজস্ব নীতি : Contra Cyclical Fiscal Policy]

[মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে এবং মন্দা থেকে পরিত্রাণে রাজিস্ব নীতির ভূমিকা কীরূপ? পূর্ণ নিয়োগ অর্জনের লক্ষ্যে রাজস্ব নীতি কীরূপ ভূমিকা পালন করে?]

মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বলতে মুদ্রাস্ফীতিহীন ও মুদ্রা সংকোচহীন (Non Inflationary and none Deflationary) একটি অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝানো হয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গৃহীত রাজস্ব নীতিকে চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি বলে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করে এবং মন্দা থেকে পরিত্রাণ এনে মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই হলো চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতির লক্ষ্য।

I) মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে রাজস্ব নীতির ভূমিকা :

মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান (gap)-এ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। তাই রাজস্ব নীতির লক্ষ্য হলো মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর করা। রাজস্ব নীতির উপকরণগুলোকে প্রয়োগ করে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর করা যায়। সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি (Contractionary fiscal policy) অবলম্বন করে AD-এর স্থানান্তর সম্ভব।

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাজস্ব নীতির উপকরণ সমূহ :

১. সরকারি ব্যয় : সরকারি ব্যয় হ্রাস করতে হবে। বিশেষত অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজন। তবে উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কখনো ঠিক নয়। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সরকারকে সুচিন্তিতভাবে ব্যয় পরিচালনা করতে হবে। যাতে পূর্ত কর্মসূচির নামে অর্থের অপচয় না হয়। যাতে প্রলম্বিত (Long gestation period) শিল্পে বিনিয়োগ না হয় এবং মৌলিক বুনিয়াদ সৃষ্টির নামে সামাজিক ব্যয় মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়।

২. কর : মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে করের ভূমিকা যথেষ্ট। প্রগতিশীল আয় কর দ্বারা সামগ্রিক চাহিদা কমানো সম্ভব। তাছাড়া ব্যয় করের মাধ্যমে জনগণের চলতি ব্যায় কমানো হলে দেশের সঞ্চয়প্রবণতা বাড়বে। প্রগতিশীল হারে মুনাফা কর ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হার।

৩. সরকারি ঋণ : সরকার জনগণের নিকট হতে ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করলে নগদ অর্থের সমাগম কমে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ হ্রাস পায়।

(II) মন্দা থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির ভূমিকা

[বেকারত্ব দূরীকরণে তথা পূর্ণ নিয়োগ অর্জন রাজস্ব নীতির ভূমিকা]

সামগ্রিক চাহিদার অভাবের কারণে দেশে বেকারত্ব ও মন্দা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেট অবলম্বন করে মন্দা থেকে পরিত্রাণে চেষ্টা নেয়া হয়। কর স্থির থেকে বা করের তুলনায় সরকারি ব্যয় বাড়লে অথবা করের পরিমাণ কমলে দেশের বেকারত্ব কমানো যায়। পূর্ণ নিয়োগের লক্ষ্যে দেশটি এগিয়ে যেতে পারে। কেইনসের ক্ষতিপূরণমূলক রাজস্ব নীতি (Compensatory fiscal policy) মূলত মন্দা থেকে পরিত্রাণকে ঘিরেই পরিচালিত হয়।

মুদ্রা সংকোচন ব্যবধান দূরীকরণ প্রসারমান রাজস্ব নীতি

মন্দা থেকে পরিত্রাণের তথা বেকারত্ব দূরীকরণে রাজস্ব নীতির গ্রহণযোগ্য উপকরণসমূহ :

১. সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াতে পারে।

২. পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগ ব্যয়কে উৎসাহিত করার জন্য সরকার হস্তান্তর ব্যয়ের সাহায্য নিতে পারে।

৩. সরকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে বন্ড ক্রয় করতে পারে, যাতে সেই প্রতিষ্ঠানের হাতে বহনযোগ্য ব্যয় অর্থের পরিমাণ বাড়ে। বন্ড ক্রয়কে সরকারি ঋণের পর্যায়ভুক্ত করে তাকে রাজস্ব নীতির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।

৪. ক্ষতিপূরণ ব্যয় (Compensatory expenditure) বাড়ানো প্রয়োজন। যেমন–বেকার ভাতাসহ পূর্ত কার্যক্রম হাতে নিয়ে সরকার সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে।

৫. করের পরিমাণ হ্রাস করে ভোগ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকার সাহায্য করতে পারে।

(III) চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতির সীমাবদ্ধতা

১. সমালোচকগণ মনে করেন, রাজস্ব নীতি দ্বারা মোট ব্যয় বাড়লেই উৎপাদন বাড়ে না।

এ সমালোচনা উত্তরে বলা হয়, সমাজের মোট ব্যয় বৃদ্ধি অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে। সাময়িকভাবে তা উপলব্ধি করা না গেলেও সমায়ান্তরে গুণক প্রক্রিয়া অবশ্যই কার্যকর হবে।

২. চক্রাবিরোধী রাজস্ব নীতির আরেকটি সমালোচনা বলা যায় যে সরকারি পর্যায়ে কিছু নিয়োগ বাড়লেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, মন্দাবস্থায় উদ্যোক্তাগণের প্রত্যাশা কম থাকে। সরকার সেই প্রত্যাশাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য সাহায্যকারী পদক্ষেপ হিসেবে ক্ষতিপূরণীয় রাজস্ব নীতি অবলম্বন করতে পারে।

৩. প্রসারমান রাজস্ব নীতি দ্বারা সরকার অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে। ফলে ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ক্ষুণ্ন হয়। এ সমালোচনার উত্তরে বলা হয়, ব্যক্তিতন্ত্রবাদের অবসান বহু পূর্বেই ঘটেছে। ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দা এবং রাজস্ব নীতি স্বীকৃতিই তার প্রমাণ।

৪. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতি সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি দ্বারা সম্ভব নয়। এ সমালোচনার উত্তরে বলা যায় যে রাজস্ব নীতি যদি চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকেও ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। তাছাড়া রাজস্ব নীতি যদি এককভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, আর্থিক নীতির সহযোগিতা দ্বারা সেই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায়, চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যই কাম্য। তবে তার সাফল্য নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস প্রদান এবং সঠিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়ার ওপর।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক ও রাজস্ব নীতির তুলনামূলক কার্যকারিতা (Relative Effectiveness off Monetary and Fiscal Policy in Controlling Inflation)

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক ও রাজস্ব নীতি উভয়ই কার্যকর। তবে তুলনামূলকভাবে কোন নীতিটি অধিক ফলপ্রসূ তা বিবেচনা করতে হবে। বাণিজ্যক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে মাধ্যমে এবং মুদ্রার পরিমাণকে কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। অর্থের যোগান কমলে সুদের হার বাড়ে এবং বিনিয়োগ হ্রাস পায়। তখন সামগ্রিক চাহিদা কমে। মুদ্রাস্ফীতি তখন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বিনিয়োগ ব্যয় যদি যথেষ্ট কমে যায়, তবে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন দেশ আবার মন্দার দিকে ধাবিত হতে পারে এবং বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতির সময় সংকোচনমূলক রাজস্ব নীতি গৃহীত হয়। সরকার যদি ব্যয় কমায় এবং করের পরিমাণ বাড়ায়, তখন সামগ্রিক চাহিদা কমে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকার যদি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমায় তবে দেশের জন্য তা কল্যাণকর। তবে বিনিয়োগকারীদের ওপর প্রগতিশীল হারে কর আরোপিত হলে বিনিয়োগ প্রত্যাশা কমে যেতে পারে। তখন মোট উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। এখন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। যদি এমন হয় যে সুদের হারের সঙ্গে বিনিয়োগ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, তবে অর্থের যোগান কমালে সুদের হার বাড়লেও বিনিয়োগ তেমন কমে না। অর্থ বাজারের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী না হলে আর্থিক নীতির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি অবলম্বন করা হলেও দেশজ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (গ্রাম্য মহাজন) কর্তৃক ঋণের পরিমাণ সংকুচিত নাও হতে পারে। তখন মুদ্রাস্ফীতি গতি রোধ করা যায় না। সুতরাং সংকোচনমূলক আর্থিক নীতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ নাও হতে পারে, বরং কঠোর সংকোচনমূলক নীতি অবলম্বন করা হলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি যখন অতিরিক্ত মজুরি বৃদ্ধির কারণে সংঘটিত হয়, তখন আর্থিক নীতি কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে আর্থিক নীতির ন্যায় এরূপ সীমাবদ্ধতা লক্ষ্যে করা যায় না। মুদ্রাস্ফীতি যখন প্রবল হয় এবং সেই মুদ্রাস্ফীতি যখন চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ঘটে, তখন সরকারি ব্যয় হ্রাস ও কর আরোপ নীতি ফলদায়ক হয়। ব্যয় হ্রাস ও কর বৃদ্ধি করলে সরকারের নিকট উদ্বৃত্ত বাজেট সৃষ্টি হয়। উদ্বৃত্ত বাজেট সৃষ্টি হলে সরকারের অর্থ তহবিল অব্যবহিত অবস্থায় থাকে। তখন অর্থের যোগান কমে যায়। অর্থের যোগান কমলে সুদের হার বাড়ে। ফলে বিনিয়োগ হ্রাস পায়। রাজস্ব নীতির দ্বৈত প্রভাব এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। একদিকে রাজস্ব নীতি নিজ প্রভাবের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা কমায় আবার পরোক্ষভাবে রাজস্ব নীতি আর্থিক নীতিকে প্রভাবিত করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারে। তাই মুদ্রাস্ফীতি রোধে আর্থিক নীতির চেয়ে রাজস্ব নীতি অধিক কার্যকর বলা যায়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য গৃহীত রাজস্ব নীতিকে চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি বলে;
- মুদ্রাস্ফীতি রোধে আর্থিক নীতির চেয়ে রাজস্ব নীতি অধিক কার্যকর বলা যায়।

পাঠ ১২.৪ ফিলিপস রেখা
Phillips Curve

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ফিলিপস রেখার সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ট্রেড অব কী? তা জানতে পারবেন;
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মূলপাঠ

ফিলিপস রেখা (The Phillips Curve)

১৯৫৮ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সে এ ডাব্লিউ ফিলিপস একটি নিবন্ধ পেশ করেন। নিবন্ধটির নাম "The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage in the United Kingdom", এই নিবন্ধটির ওপর ভিত্তি করেই সামষ্টিক অর্থনীতিতে 'ফিলিপস রেখা' প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

ফিলিপস রেখার সংজ্ঞা : যুক্তরাজ্যের প্রাপ্ত তথ্যের (১৮৬১-১৯৫৭) ভিত্তিতে আর্থিক মজুরির হার ও বেকারত্বের হার এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশকারী যে রেখাটি ফিলিপস অঙ্কন করেছিলেন তাকে ফিলিপস রেখা বলে। ১২.৪.১ চিত্রে তা দেখানো হলো :

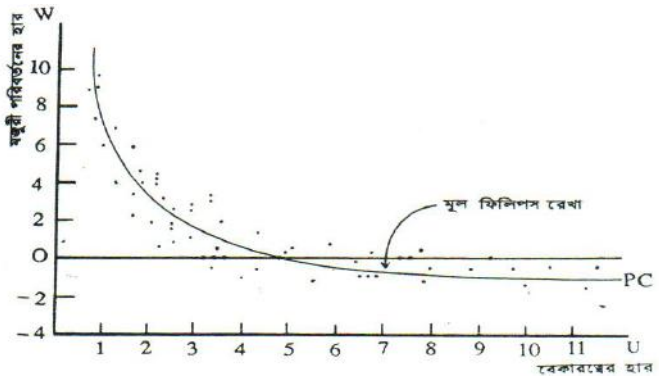

চিত্র ১২.৪.১ : মূলফিলিপস রেখা

মূল ফিলিপস রেখার আর্থিক মজুরির হার ও বেকারত্বের মধ্যে ট্রেড অব (বিনিময়) নির্দেশ করা হলে পরবর্তীতে আর্থিক মজুরি হারের পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতি হার কথাটি অধিক ব্যবহৃত হয়। তাই বলা যায় বিভিন্ন বিন্দুতে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ পায় এবং তাতে দেখানো হয় বেকারত্বের হার হ্রাস করতে হলে মজুরি-মুদ্রাস্ফীতি হার বৃদ্ধি করতে হবে।

(ক) ট্রেড অব কথাটির অর্থ কী?

ফিলিপস রেখায় প্রকাশ পায় যে আর্থিক মজুরির হার ও বেকারত্বের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত অর্থাৎ মজুরির হার বাড়লে বেকারত্ব হার কম। আর্থিক মজুরি হারের বৃদ্ধির সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি হারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। তাই বলা যায় মুদ্রাস্ফীতি হার

বাড়লে বেকারত্ব হার কমবে। আর বেকারত্ব হার বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি হার কমবে। সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে কোনটি কাম্য। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে বিনিময় প্রক্রিয়াভিত্তিক কাম্য অবস্থা নির্ধারণ করতে সমাজে ট্রেড অব বলে।

(খ) মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব কোন অর্থে বিবেচিত?

মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে দাম স্তরের তথা মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। মজুরি বাড়লে দাম স্তর বাড়ে এবং দাম স্তর বাড়লে আবার মজুরি বৃদ্ধি প্রবণতা থাকে, ফলে দাম স্তর আবারও বাড়ে। দাম স্তর বৃদ্ধির হার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি হার নির্দেশ করা হয়। আর সেই দাম স্তর বৃদ্ধি হার সরাসরি মজুরি বৃদ্ধির হারের সঙ্গে জড়িত। সেজন্য ফিলিপস রেখা বিশ্লেষণে অনেক সময় মজুরি মুদ্রাস্ফীতি হার (wage -Inflation rate) কথাটি ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে উৎপাদন কাজের যোগ্য এবং নির্দিষ্ট মজুরিতে কাজ পাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনভিপ্রেতভাবে যখন কর্মহীনতা বজায় থাকে, তাকে বেকারত্ব বলে। অর্থনীতিতে বিরোধী পরিস্থিতির কারণে কিছুটা বেকারত্ব সব সময় থাকে, তাকে সংঘাতমূলক বেকারত্ব (Frictional unemployment) বলে। সংঘাতমূলক বেকারত্ব, যা এড়ানো যায় না, তাকে বাদ রেখে বাকিদের মধ্যে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক সবাই কাজ পেলে সাধারণভাবে পূর্ণ নিয়োগের সম্ভাবনা সূচক অবস্থা বলা যায়। আর পূর্ণ নিয়োগের সম্ভাবনাসূচক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উৎপাদন বা আয়কে পটেনশিয়াল (potential) উৎপাদন বা আয় বলে।

পটেনশিয়াল আয় বা উৎপাদনক্ষেত্রে বেকারত্ব পরিমাণ শূন্য (০) হয় না। সুতরাং দেশের পটেনশিয়াল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেকারত্ব; যেমন–যুক্তরাষ্ট্রে ৬% বেকারত্বকে বেকারত্বের স্বাভাবিক হার (Natural Rate of Unemployment) বলে।

মূল ফিলিপস রেখা (The Original Phillips Curve)

মূল ফিলিপস রেখায় আর্থিক মজুরির হার ও বেকারত্ব মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ পায়। অর্থাৎ বেকারত্ব কমাতে চাইলে মজুরি বাড়াতে হবে। ফিলিপস একটি Scatter Diagram করেন তারপর বিভিন্ন বিন্দুর সমন্বয়ে একটি রেখা সংযোজন (Curve fit) করেন। আর সেটাই হলো ফিলিপস রেখা। PC রেখাটিকে একটি কাল্পনিক ফিলিপস রেখা বলা যায়।

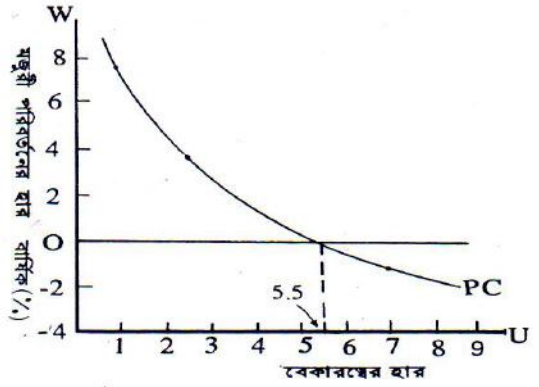

চিত্র ১২.৪.২ : ফিলিপস রেখা

১২.৪.১ চিত্রে লক্ষ করা যায়, বেকারত্ব হার যখন অধিক তখন ফিলিপস রেখাটি তেমন খাড়া নয় কিন্তু কম বেকারত্ব হারের ক্ষেত্রে রেখাটি বেশ খাড়া। কাজেই বেকারত্ব যখন যথেষ্ট, তখন কিছুটা বেকারত্ব কমাতে চাইলেই মজুরির হার বৃদ্ধির তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বেকারত্ব যখন প্রকৃত অবস্থায় কম আর সেই অবস্থায় বেকারত্বকে আরো নামাইতে চাইলে যথেষ্ট পরিমাণ মজুরি বৃদ্ধির (তথা মুদ্রাস্ফীতির) প্রয়োজন হবে। কাজেই নীতি নির্ধারকগণকে স্থির করতে হয় বেকারত্ব হার ও মজুরি হারের মুদ্রাস্ফীতি হার) মধ্যে কোন অবস্থাটির বিনিময়ে কোনটি কাম্য, অর্থাৎ মূল ফিলিপস রেখা মজুরি মুদ্রাস্ফীতি হার এবং বেকারত্ব হার এই দুয়ের মধ্যে ট্রেড অব নির্দেশ করে। যেমন ১২.৪.৩ চিত্রে দেখা যায় বেকারত্ব হার যখন কম, মজুরির হার তখন বেশি। আবার বেকারত্ব হার যখন বেশি, তখন মজুরির হার কম।

চিত্র থেকে যা পাওয়া গেল তা মজুরি হার ও দাম স্তর প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের সঙ্গে বেকারত্ব হারের সম্পর্ক বিপরীত। ফিলপস রেখা থেকে আরো জানা যায়, আর্থিক মজুরি যদি স্থিতিশীল রাখতে হয় (অর্থাৎ মজুরির পরিবর্তন যদি শূন্য হতে হয়) তবে তার জন্য ৫.৫% বেকারত্ব দেশে থাকতে হবে। আর দাম স্তর যদি স্থিতিশীল রাখতে হয়, অর্থাৎ দামের পরিবর্তনের হার শূন্য হতে হলে ২.৫% বেকারত্ব দেশে থাকতে হবে। কাজেই ফিলিপস রেখা অনুসারে বলা যায় দেশের বার্ষিক উৎপাদনশীলতা যে হারে বাড়ে, মজুরিও যদি একই হারে বাড়ে, তবে দাম স্তর স্থিতিশীল থাকবে।

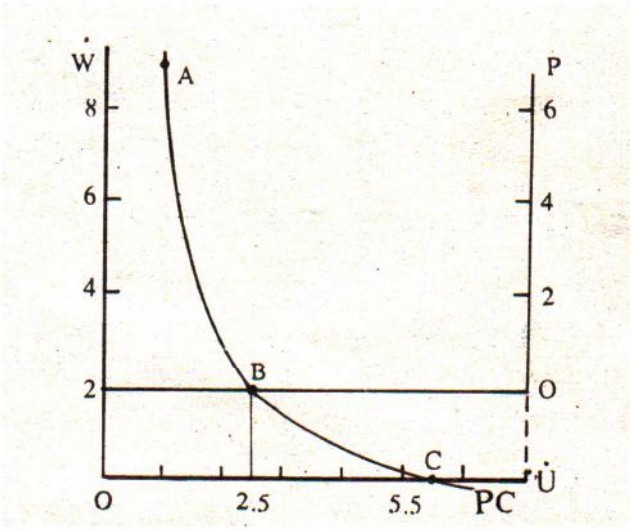

চিত্র ১২.৪.৩ : মজুরি হার তথা মুদ্রাস্ফীতির হার এবং বেকারত্বের মধ্যে সম্পর্ক

দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা (নতুন ফিলিপস রেখা : স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখার সমন্বয়) [Long Run Phillips Curve (The New Phillips Curve : Intergation of Short Run and Long Run Phillips Curve)]

ফ্রিডম্যান ও ফিলিপস তাঁদের বিশ্লেষণে ফিলিপস রেখাকে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করেন–স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন। ফিলিপসের মূল রেখাটি স্বল্পকালীন রেখা হিসেবে পরিচিত। স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা বলতে সেই রেখাকে বোঝানো হয়, যার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের সম্পর্ক প্রকাশ পায় এবং তখন প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি (Anticipated Inflation) স্থির থাকে। অপরদিকে দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা বলতে সেই রেখাকে বোঝানো হয়, যার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়, যখন প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতির হার এবং প্রকৃত হার (বাস্তব) মুদ্রাস্ফীতির হার পরস্পর সমান।

স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা (মূল ফিলিপস রেখা) দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের ঋণাত্মক সম্পর্ক দেখানো হয়। সে ক্ষেত্রে কম মুদ্রাস্ফীতির অর্থ হলো অধিক বেকারত্ব এবং কম বেকারত্বে অর্থ হলো অধিক মুদ্রাস্ফীতি। দীর্ঘ কালীন ফিলিপস রেখা একটি উল্লম্ব রেখা, যার দ্বারা দেখানো হয় যে দীর্ঘকালে মুদ্রাস্ফীতির হার অপেক্ষা বেকারত্বের হার স্বাধীন। দীর্ঘকালে অধিক মুদ্রাস্ফীতির বিনিময়ে বেকারত্ব হার হ্রাস করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

- আর্থিক মজুরির হার ও বেকারত্বের হার এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশকারী যে রেখাটি ফিলিপস অঙ্কন করেছিলেন তাকে ফিলিপস রেখা বলে;
- মূল ফিলিপস রেখায় আর্থিক মজুরির হার ও বেকারত্ব মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ পায়। অর্থাৎ বেকারত্ব কমাতে চাইলে মজুরি বাড়াতে হবে।

ইউনিট মূল্যায়ন-১২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আর্থিক নীতি কাকে বলে?
২. আর্থিক নীতির উপকরণসমূহ কী?
৩. ট্রেড অব কাকে বলে?
৪. ফিলিপস রেখার সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।
২. রাজস্ব নীতি কী? রাজস্ব নীতির উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।
৩. মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষায় রাজস্ব নীতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৪. মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতির ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৫. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আর্থিক ও রাজস্ব নীতির তুলনামূলক ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৬. মূল ফিলিপস রেখাটি অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করুন।
৭. দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা বিশ্লেষণ করুন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
এমবিএ প্রোগ্রাম (বাংলা মাধ্যম)
বিষয় কোড: MBA-1205
[দ্রষ্টব্য: যেকোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১৬]

সময়: ৩ ঘন্টা পূর্ণমান: ৮০

১. (ক) ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতি কাকে বলে? ৪
(খ) সাধারণ অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির পার্থক্য লিখুন। ৫
(গ) ব্যবস্থাপকীয় অর্থনীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ননা করুন। ৭

২. (ক) চাহিদা ফাংশন বলতে কি বুঝেন? ব্যাখ্যা করুন। ৪
(খ) চাহিদার উপর প্রভাবকারী বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। ৫
(গ) চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করুন। চাহিদা বিধির কি কোন ব্যতিক্রম আছে? ৭

৩. (ক) যোগান বলতে কি বুঝেন? যোগান ও মজুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন ৮
(খ) চিত্রসহ যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন। ৮

৪. (ক) কি কি বিষয়ের উপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে? আলোচনা করুন। ৮
(খ) চাহিদার রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে কিভাবে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায়? ৮

৫. (ক) গড় ব্যয় রেখা কেন U আকৃতির হয়ে থাকে? ৪
(খ) দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা (LAC) কেন এনভেলাপ আকৃতির হয়? ৬
(গ) পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কিভাবে বর্ণিত হয়? ৬

৬. (ক) একচেটিয়া কারবার- এর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। ৬
(খ) একচেটিয়া কারবারীর স্বল্পকালীন ভারসাম্য ব্যাখ্যা করুন। ১০

৭. (ক) জাতীয় আয় কাকে বলে? ৪
(খ) জাতীয় আয়ের চক্রকার প্রবাহ কি? ৫
(গ) জাতীয় আয় এর পরিমাপ এর সমস্যা ও তার সমাধান বনর্না করুন। ৭

৮. (ক) আর্থিক নীতি কাকে বলে? ৪
(খ) আর্থিক নীতির উপকরণসমূহ কি? ৪
(গ) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে আর্থিক ও রাজস্বনীতির তুলনামূলক ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। ৮